গণ্ডি

আনোয়ারা সৈয়দ হক

আশুলিয়ার জমিতে একাকী রাত কাটাতে এসে মজিদ শিকদার দুটো অচেনা শব্দ কানে শোনে; একটু ফুস্ আরেকটা ফস্।
কষ্টিপাথরের কালো রাত ভেদ করে মজিদের সাহস হয় না দরজা খুলে শব্দের উৎস খুঁজে বের করতে।
ভবঘুরে বাতাসের বুক ফুঁড়ে সে-সময় চেনা শব্দরাও তরঙ্গ তোলে, যেমন শিরীষ গাছের পাতার শব্দ, ঝাউগাছে শোঁ-শোঁ, বা রাতের আঁধারে পথ হারিয়ে ফেলা বিভ্রান্ত কাকের কা-কা।

অচেনা শব্দ তো বটেই, চেনা শব্দেও দরজা হুড়কো খোলে না মজিদ। তার কারণ তার মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রীর ভেতরে কে যেন এই বার্তা নিমেষে পৌঁছে দিয়েছে যে জায়গাটা খারাপ। মজিদ অনভিজ্ঞ ছিল বলে এই বিরান জায়গায় জমি কেনার আগে নির্জনতার কিছু ভয়াবহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে সম্যক অবগত ছিল না বা কেউ তাকে এ-বিষয়ে কিছু বলেও দেয়নি।

জমিটা কেনার পরও কেউ তাকে এসব বুঝিয়ে বলেছে কি না সন্দেহ। বা বুঝিয়ে বললেও সে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারত কি না তা নিয়ে দ্বিমত আছে। কিছু মানুষ আছে যারা আবাল্য নিজেরাই বুকের ভেতরে নির্জনতার মাঠ তৈরি করে বড় হয়। হই-হল্লা বা হট্টগোল তাদের গুটিয়ে রাখে। তারা কথা বলে কম এবং ভাবে বেশি। মজিদ হয়তো তাদেরই একজন ছিল।

সেই মজিদই ভাগ্যের ফেরে এক মহা ফাজিল দালালের খপ্পরে পড়ে আশুলিয়ার জঙ্গলের ভেতরে দুটি চতুষ্কোণ জমি ও এক টুকরো তেকোনা বন্ধ্যা জমির পাশে পাঁচ কাঠা জমি কিনে ফেলেছিল। ব্যাপারটা ঘটেছিল গত বছরের মাঘ মাসে এবং ঘটেছিল হঠাৎ।

একদিন আশুলিয়ার বড় রাস্তা ছাড়িয়ে, মাঠঘাট ভেঙে, ডোবা, নালা, খানাখন্দ পেরিয়ে বন্ধ্যা জমিটার মরা শুকনো ঘাসগুলো পাছের উড়ন্ত গতিতে বাতাসে ছত্রখান করে দিয়ে মজিদ সিগতার এসে দাঁড়িয়েছিল দালাল কথিত জমিটার ঠিক মাঝখানে।

'এই হ'তিছে সেই জমি', আঙুল তুলে চারপাশে এক ঘূর্ণি দিয়ে বলেছিল দালাল। তার আগ পর্যন্ত দালাল লোকটিকে ভালো করে চোখ তুলেও দেখেনি মজিদ। জমির মাঝখানে দাঁড়াবার পর দাদালকে সে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেছিল। সরু ছুঁচালো একটা মুখ। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। নাক যেন বাজপাখি। চোখ দুটোও তাই, অর্থাৎ বাজপাখির মতোই তীক্ষ্ণ ও ক্ষুধার্ত। দেখে তখন ভালো লাগেনি মজিদের। কিন্তু তাতে কিছু এসে-যায়নি। কারণ, এসব কিছু দেখার আগেই মজিদ দেখে ফেলেছিল আসলে যা দেখার।

সেটা হলো একটা তালগাছ। মজিদের চোখের সামনে আকাশের বুক ফুঁড়ে সটান দাঁড়িয়েছিল গাছটা। আর সেই তালগাছে ঝুলে ছিল অসংখ্য বাবুই পাখির বাসা। বাসাগুলো যেন লম্বা লাউয়ের শুকনো খোলের মতো বাদামি খড়ের আবৃত হয়ে শূন্যে ঝুলছিল। কখনো-বা বাতাসে দুলছিল মৃদু মৃদু। অজস্র রোদ উঠেছিল সেদিন। রোদের ভেতরে কুরচি ফুলের গন্ধ ভেসে এসেছিল যেন কোত্থেকে।

এখন কি কুরচি ফুলের সময়? মনে মনে তখন ভেবেছিল মজিদ। নাকি গন্ধটি তার মনের ভেতরে, এবং সে তখন সেটা জানত না? কিন্তু তাতে কিছু এসে যায়নি। কারণ ততক্ষণে সে মনস্থির করে ফেলেছিল যে এই জমিটাই সে কিনবে। এরকম এক জমির স্বপ্নই যে দেখেছিল ছেলেবেলা থেকে। যে জমিতে দাঁড়িয়ে থাকবে একটা তালগাছ। তালগাছের শেকড়ে থাকবে বহু পুরনোদিনের গন্ধ। অতীত, অতীতের অতীত এবং তারও অতীত বাহুলগ্ন হয়ে শুয়ে থাকবে মাটিতে, যে-মাটির ভেতরে মজিদের হাজার বছরের পূর্বপুরুষেরা তাদের গায়ের গন্ধ, ঘামের গন্ধ, স্বপ্নের গন্ধ, হাহাকারের গন্ধ বড় নিবিড়ভাবে ফেলে রেখে চলে গেছে দূর অচেনার দেশে।

স্বপ্নাভূত চোখে মজিদ কিছুকাল জমির ওপর স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে দালালের দিকে তাকিয়েছিল সেদিন। সে দৃষ্টিতে কী ছিল দালাল যেন তার মুহূর্তে বুঝে ফেলে হাতের পাঁচ আঙুল একটার পর আরেকটা মটকে নিয়ে বলেছিল, 'তা'লি জমিয়ালার সাথে এখন কথা বলতি হয়!'

তো হলো কথা বলো। সেটা ছি মাঘ মাস। বাতাসে ছিল ফাল্গুনের গন্ধ। জমির আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা কতিপয় বৃহৎ বৃক্ষের ডালপালায় কীসের যেন এক আনন্দ- উচ্ছ্বাস ক্রমাগত এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কিম্ভুতকিমাকার সব শব্দ করে আলোকিত করেছিল বাতাস। হালকা শীতের আমেজে বড় রহস্যময় দেখাচ্ছিল তখন জমিটাকে। আর মজিদ সিকদারের কাছে মনে হয়েছিল, পুরো ব্যাপারটা বুঝি অতীন্দ্রিয় কোনো জগতের ভেতরে ক্রম প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়া।

জমি কেনার পর রাশিদা, সুমন আর টাবলু এসেছিল জমি দেখতে। গোড়ালির ওপর কাপড় তুলে, রোদের তাপে মাথায় হালকা ঘোমটা টেনে, এবড়োখেবড়ো মাটির ঢেলা ভাঙতে ভাঙতে রাশিদা যখন জমির ওপরে পা রেখেছিল, তখন শীত শেষ গ্রীষ্মও তার মাঝপথ প্রায় পাড়ি দিয়ে ফেলেছে। গরমে নাকের পাতা, কপাল, ঘাড় ও গলা ঘেমে গিয়েছিল রাশিদার। বড় ক্ষুণ্ণ এবং অনিচ্ছুক হয়ে এদিক-ওদিক চারিদিক দেখতে দেখতে বলে উঠেছিল, তোমার কি মাথা খারাপ? এতগুলো ডাকা লোন নিয়ে কেউ এরকম জায়গায় জমি কেনে? সদর রাস্তায় ওঠার জন্য এ-জমির পাশে রাস্তা কই?

রাশিদার প্রশ্নের উত্তরে বন্ধ্যা জমিটার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে মজিদ বলেছিল, কেন এই জমির ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে আলপথে পড়ে তারপর চৌকো জমি দুটো পার হতেই তো সদর রাস্তা।

তুমি কি ভাবছ যাদের জমি তারা তোমার সুবিধের জন্য নিজের জমি থেকে রাস্তা কেটে তোমার চলাচলের ব্যবস্থা করে দেবে? হায়রে অবোধ!

রাশিদার কথা শুনে মনে মনে ভীষণ রাগ হয়েছিল মজিদ সিকদারের। ভেবেছিল, যখনই সে জীবনে নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করতে গেছে তখনই যেন পেছন থেকে তার জামা টেনে ধরেছে রাশিদা নাম্নী এই নারী। মজিদ এ-ধরনের সম্পর্কে বিশ্বাস করে না, পা জড়িয়ে গড়ে থাকে চিরকাল; নড়তে চড়তে দেয় না, ইচ্ছেমতো ভাবনা-চিন্তা করতে দেয় না, এমনকি ইচ্ছেমতো স্বপ্ন দেখতেও দেয় না!

আর রাগ হয়ে মজিদ তখন এক ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। সে গুটিয়ে যায় নিজের ভেতরে। কেন্নোর গোটানোও তখন মজিদের গোটানোর কাছে সোজা!

এর পরের ইতিহাস ছিল সংক্ষিপ্ত। মজিদ সিকদার ব্যাংকের কাছ থেকে আরো লোন নিয়েছিল, একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকেও নিয়েছিল এক ভারী অঙ্কের লোন। সেই লোনের টাকা আশুলিয়ার ইটখোলা থেকে ইট কিনে নিয়ে এসেছিল সে। ঠেলার পর ঠেলা। এক ঠেলা ইট জমিতে পৌঁছে গেলে আরেক ঠেলা। এতে ট্রাক-ভাড়ার পয়সা কিছুটা বেঁচেছিল তার। জমিতে ইট ফেলে ফেলে ইটের স্তূপ করে ফেলেছিল মজিদ। তারপর ফেলেছিল

বালু ও সিমেন্ট। এরপর ডেকে এনেছিল তিন সাগরেদসহ জিন্সের ফুলপ্যান্ট, হাতে কালো ব্যান্ডের ঘড়ি, চোখে কালো চশমা। তার প্যান্টের পকেটে ছিল মোবাইল। সে এক ভীষণ চোখ-ধাঁধানো অবস্থা! মজিদ তখন শঙ্কিত হয়ে ভেবেছিল তাকে দিয়ে রাজমিস্ত্রির কোনো কাজ আদৌ হবে কি না। কিন্তু মজিদকে বোকা বানিয়ে রাজমিস্ত্রি কাজ করেছিল ফার্স্টক্লাস। নকশামাফিক সে গড়ে তুলেছিল একটা ঘর। ওপরে টিনের চাল দেওয়া লম্বা একটা একচালা। সামনে পৈঠার মতো উঁচু করে তৈরি করা একটা বারান্দা। ঘরের শেষপ্রান্তে বসেছিল দেশি পায়খানা। আর উঠোনে বসিয়েছিল টিউবওয়েল। সব মিলিয়ে ব্যবস্থাটা খারাপ ছিল না। মেনকি তেমন অবস্থা হলে ঢাকার ভাড়াবাসা ছেড়ে এখানে এসেও বসবাস করতে পারবে পরিবারসহ একথাও ভেবেছিল তখন মজিদ।

কিন্তু মনে ভাবলেও মজিদের প্ল্যানমাফিক সবকিছু হয়নি। হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। বাড়ি তৈরির সময় মাঝে মাঝে রাশিদা দেখতে এলেও এখানে সে বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় মশার কামড় খেতে খেতে রাত কাটাবে কোনোদিন, এরকম মনোভাব দুর্বল কোনো মুহূর্তেও সে দেখায়নি তবে নিজেরা না থাকলেও যে এখানে ভাড়াটে বসানো সম্ভব একথা একেবারে নাকচ করে দেয়নি রাশিদা।

কিন্তু ভাড়াটে বসাতে মজিদ রাজি ছিল না। নিজের মনের মতো ঘর তৈরি করে সে ঘরে ভাড়াটে বসানো এটা মন থেকে মানতে পারেনি। আর এ-কারণেই রাশিদার ওপর কিছুটা রাগ করেই গতকাল বিকেলে আশুলিয়ায় চলে এসেছিল সে।

অফিস ছুটির পর সোজা সে চলে এসেছিল তার জমিতে। বৃহস্পতিবার বলে একটু সকাল করে অফিস থেকে রওনা দিয়েছিল। পথে কলা, পাউরুটি, চিনি, দুধ আর চা পাতা কিনেছিল। এগুলো তার রাতের খাবার। ক'দিন আগে সে একঠোঙা চিঁড়ে কিনে রেখেছিল আশুলিয়ার ঘরে। সুতরাং খাবারের অভাব ছিল না। সঙ্গে চার ব্যাটারির বড় টর্চও রেখেছিল একটা। রেক্সিনের ছোট একটা হাতব্যাগে টর্চটা যত্নকরে সে ভরে নিয়েছিল।

তবে জমিতে আসার আগে রাশিদার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছিল বলে মন একটু বিক্ষুব্ধ ছিল তার। একটু-বা বিভ্রান্তি ছিল মনে। জমিতে পা দিয়ে প্রথমে ভেবেছিল একবার রাশিদাকে মোবাইল করে জানায় যে সে আশুলিয়ায় চলে এসেছে। এখানেই আজ সে রাত কাটাবে এবং সেই সঙ্গে আগামীকালের রাতও। পরশু এখান থেকেই সোজা চলে যাবে অফিসে। অফিসের জামাকাপড় তার সঙ্গেই আছে। এটা ছিল তার রীতিমতো একটা প্ল্যান।

কিন্তু মজিদ মোবাইল করেনি। বদলে সে ঘরে ঢুকে খাবারগুলো গুছিয়ে রেখে আবার বেরিয়ে পড়েছিল বাইরে। তারপর বন্ধ্যা জমি পায়ে মাড়িয়ে, আলপথ ভেঙে, চতুষ্কোণ ক্ষেত দুটো ডিঙি মেরে মেরে পার হয়ে দেখা করতে গিয়েছিল এক প্রতিবেশীর সঙ্গে। এখানে বাড়ি তৈরি করার সময় সে দুর থেকে টিনের দোচালা বাড়িটা তাকিয়ে দেখত। কিন্তু কোনোদিন সুযোগ হয়নি সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করার। এই বাড়িটাই হলো তার বাড়ির সবচেয়ে কাছে। বাড়িটাকে ঘিরে আছে প্রচুর গাছপালা। এমনসব গাছ মজিদ যাদের চেহারা আগে দেখেনি বা যাদের নাম জানে না। মজিদ আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল—এসব গাছ চেনে এবং ইতোমধ্যেই তার বাড়ির সীমান ঘিরে চারাগুলো পুঁতে ফেলেছে। সীমানার চারিদিকে বাঁশে চটার বেড়াও দিয়ে ফেলেছে সে।

প্রতিবেশীর বাড়িতে যখন সে গতকাল ঢুকেছিল তখন সন্ধ্যে ঘোর হয়ে নেমেছে। আজান পড়ে গেছে। বাড়ি চৌহদ্দি বেশ বড়। মজিদের হাঁকডাকে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল একজন মাঝবয়সী লোক। মুখে তার কাঁচাপাকা দাড়ি। চোখে একটা বিরক্ত ভাব নিয়ে মজিদকে আগাগোড়া জরিপ করে সে জিজ্ঞাসা করলেছিল, কী চাই?

শহুলে মানুষদের মতো গ্রামের মানুষের ব্যবহার দেখে মনে মনে চমকিত হয়েছিল মজিদ। একটু আমতা আমতা করে বলেছিল, কিছু চাই না ভাই সাহেব, এই প্রথম আপনাদের এলাকায় রাত কাটাতে এলাম, তাই ভাবলাম দেখা করে যায়।

উত্তরে লোকটা কিছু বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকলে মজিদ আঙুল তুলে দূরে দেখিয়ে বলেছিল, এই যে জমিটা দেখছেন, ওটা আমার জমি। ঘর তুলেছি একটা কিছুদিন হলো। জানি। উত্তরে লোকটা বলেছিল। তারপর ঘরের দাওয়ায় হাতলভাঙা চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে বলেছিল, এখানে বসেন, আমি মোনাজাতটা সেরে আসি।

আরে ছি, ছি, আপনি নামজা পড়ছিলেন আমি বুঝতে পারিনি ভাই সাহেব, মাফ করবেন।

কথা বলে ফিরে যাবার উদ্যোগ নিতে লোকটা বলেছিল, আরে না, না, তা কী হয়। নামাজ তো মুসলমানের জীবনভর লেগেই আছে! আপনি বসেন। বসেছিল মজিদ। বসে এদিক-ওদিক তাকিযে দেখেছিল। পাতলা অন্ধকার কত দ্রুততার সঙ্গে গাঢ় হয়ে হয়ে হার নাড়ছিল রাতের কাছে— সেটা দেখে একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিল তার মন। সে নিজের হাতের রেক্সিনের ব্যাগে টর্চলাইটটা একবার হাতিয়ে দেখেছিল ঠিক আছে কি না। দাওয়ার এক কোনে জ্বলছিল একটা হারিকেন। এদিকে বিদ্যুৎ এখনো আসেনি। কিন্তু বিদ্যুতের পিলার গাঁথা হয়েছে। হয়তো আর কিছুদিনের ভেতর বিদ্যুৎ এসে যাবে। চারদিকে তাকিয়ে দেখে এইসব তখন ভেবেছিল মজিদ। আর লোকটার নামাজ শেষ করে ফিরে আসার অপেক্ষা করেছিল। বাড়ির মধ্যে আর কারো আওয়াজ পাচ্ছে না মজিদ । মনে হয়েছিল মাঝবয়সী লোকটা ছাড়া আর কেউ সে-বাড়ি তখন ছিল না।

একটু বলে লোকটা তার মুখে হাত বুলোতে বুলোত ফিরলে উসখুস করে উঠে মজিদ বলেছিল, আমার নাম মজিদ সিকদার। আপনার নামটা কি জানতে পারি?

আমি সুলেমান মণ্ডল। লোকটা বলেছিল। আপনি কি এখানে একা থাকেন? এরপর জিজ্ঞেস করেছিল মজিদ।

না, আমার ভাইঝি আর ভাইঝি-জামাই থাকে। তারা বাইরে গেছে। উত্তরে বলেছিল সুলেমান মন্ডল।

একটা কি আপনার বাড়ি? আচমকা এবার জিজ্ঞেস করেছিল মজিদ।

মজিদের প্রশ্ন শুনে লোকটা কেমন যেন এক ভাঙাচোরা চেহারা নিয়ে তাকিয়ে ছিল শূন্যে। সেখান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মজিদের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, না, আমার বাড়ি না। তবে এককালে আমার সব ছিল। এখন আমার কোনো জমি নাই! কথাটা শুনে বুক যেন ধক করে উঠেছিল মজিদের। তখনই যেন উপলব্ধি করেছিল যে, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সময় প্রত্যেক মানুষের একখণ্ড জমির বড় প্রয়োজন!

এরপর যেন আপনমনে সুলেমান মণ্ডল বলেছিল, গত বৈশাখ মাসে আমার স্ত্রী মারা গেছে।

তারপর কথা শুনে চুপ করে গিয়েছিল মজিদ। যেন একটু হতাশ হয়েছিল। যেন কী একটা আশা করেছিল সে। কিন্তু সেটা কী যে তা বুঝতে পারছিল না। যেন এই পরিবেশে একটা সুখী দাম্পত্য জীবনের ছবির কল্পনা তার মনের ভেতর অজান্তেই উঁকি দিয়েছিল তখন।

ক্রমে একটা নিরানন্দ ভাব যেন তাকে ঘিরে ধরেছিল। সে হাতলভাঙা চেয়ারটার ওপর বসে হঠাৎ পা দোলাতে শুরু করেছিল।

একটু পরে সুলেমান মণ্ডল তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছিল, ঢাকায় থাকেন?

হ্যাঁ, উত্তরে বলেছিল মজিদ। তারপর বলেছিল, ভবিষ্যতে এখানে এসে বাস করার ইচ্ছে আছে। আশা করি ততদিন বিদ্যুৎ এসে যাছে।

মজিদের কথা শুনে সুলেমান মাথা নেড়েছিল। বলেছিল, না, বিদ্যুৎ আসবে না!

বিদ্যুৎ আসবে না? অবাক হয়ে জিজ্ঞাস করেছিল মজিদ।

না। আবার বলেছিল সুলেমান।

কিন্তু বিদ্যুদের খাম্বা তো পোঁতা হয়ে গেছে? বলেছিল মজিদ।

আজ পাঁচ বছর ধরে পোঁতা আছে ওই খাম্বাগুলো। বলেছিল সুলেমান।

কী বলেন, পাঁচ?

হ্যাঁ।

পাঁচ বছর?

হ্যাঁ।

সুলেমানের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল মজিদ। ওর তখন মনে পড়েছিল, দালাল জমি বিক্রি করতে গিয়ে দাম একটু বেশি হেঁকেছিল, যেহেতু সদর রাস্তা ছাড়িয়ে ভেতরের দিকে লাইন ধরে বিদ্যুতের খাম্বা বসানো ছিল।

সুলেমান আবারো বলল, কিংবা তারও বেশি।

শুনি, শুধু খাম্বা পোঁতার কামাই ছিল সেইখান। খাম্বা পুঁইতাই হাজার হাজার ট্যাকা কামাইছিল। বিদ্যুৎ দেয় নাই।

তা হবে, বলে নিরাশ হয়ে মাথা নেড়েছিল মজিদ। তারপর বলেছিল, আমি তাইলে এবার যাই, আজ আমি প্রথম নিজের জমিতে ঘর তুলে রাত্রিবাস করব, দোয়া করবেন।

সুলেমান মণ্ডল একথা শুনে নীরবে মাথা নেড়ে বলেছিল, দোয়া করলা, তবু আপনি সাবধানে থাকবেন। এর আগে কয়েকবার ওই জমি হাতবদল হয়েছে। কাগজপত্রে কী জানি সব ঝামেলা আছে। একবার তো রক্তারক্তি হয়ে গেল।

কী বললেন? সুলেমান মণ্ডলের কথা শুনে মজিদ বলে যাবার মুখ আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। 'হ্যাঁ, কীসব ঝামেলা হয়েছে। তবে সেসব নিশ্চয় ফয়সালা হয়ে গেছে?' 'হ্যাঁ, নিশ্চয় ফয়সালা হয়ে গেছে?' মাথা হেলিয়ে বলেছিল মজিদ। কারণ জমি বায়না করা থেকে রেজিস্ট্রি পর্যন্ত তার কোনো ঝামেলা হয়নি। কেউ তাকে ইশারা করেও বলেনি যে তার জমিতে কোনো ঝামেলা আছে। আবার আলপথ ভেঙে ধীরে ধীরে মজিদ ফিরে এসেছিল তার জমিতে। হাতে টর্চ ছিল তার। টর্চ জ্বেলে পথ চলেছিল সে। ফিরে আসার পথে দু-একজনের সাক্ষাৎও পেয়েছিল। কিন্তু তাদের মুখ সে দেখতে পায়নি।

একজন তাকে আলপথ ধরে হাঁটতে দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মজিদ তখন নিজ থেকেই বলে উঠেছিল, আমি ভাই সাহেব, ওই যে ওই জমির বাসিন্দা। কথাটা বলে সে অন্ধকারে হাত তুলে দেখিয়েছিল।

ওঃ, বলে উঠেছিল লোকটা। তারপর দ্রুত পায়ে সরে গিয়েছিল।

জমিতে গিয়ে পৌঁছেছিল সে এবার ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে। জোনাকি জ্বলছিল চতুর্দিকে। এর আগেও অনেক রাত পর্যন্ত সে মিস্ত্রিদের দিয়ে বাড়ি তোলার কাজ করিয়েছিল। তাই রাতের জোনাকির সঙ্গে পরিচয় ছিল। জোনাকির মৃদু স্বপ্নময় আলোয় সে দিব্যি কলের পাড় অব্দি পৌঁছে টিউবওয়েল টিপে হাত-পা, মুখ ও গলা ভালো করে পরিষ্কার করেছিল। তারপর চাবি দিয়ে ঘর খুলে প্রথমে মোমবাতি জ্বালিয়েছিল। তারপর জ্বালিয়েছিল হারিকেন। হারিকেন জ্বালাবার পর মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছিল সে।

জমিতে কাজ চলার সময় সে চারখানা হ্যারিকেন কিনেছিল।। সম্প্রতি সে দুটো হ্যারিকেন ঢাকার বাসায় রেখে এসেছিল। সেখানে দিনেরাতে চার-পাঁচবার করে লোডশেডিং হয়। রাতে মোম জ্বালিয়ে সরকারের বিদ্যুৎ খাতকে গালি দিতে দিতে সংসারের কাজ সারে রাশিদা। হ্যারিকেন দুটো হাতে পাওয়ায় রাশিদার সুবিধে হয়েছিল।

এরপর নিজের ঘরের দিকে ভালো করে দৃষ্টি ফেলেছিল মজিদ। দেয়ালে রং এখনো সামান্য ভিজে আছে। মেঝেটা কালো আর সাদা সিমেন্টের মিশেলে তৈরি। ঘরের এককোনে সেমিডাবল একটা খাট। আগে এই খাটে রাতের বেলা একজন মিস্ত্র ঘুমাত। খাটের ওপর নতুন পার্টি পেতেছিল মজিদ। তার ওপরে পেতেছিল হাতে কাচা পরিষ্কার চাদর। এখানে রাত্রিবাস করবে বলে বেশ কিছু সপ্তাহ ধরে মাজিদ মনে মনে প্রস্তুত হয়েছিল। খুব ভালো লাগত যদি রাশিদা আর ছেলে দুটো আজ তার সঙ্গে থাকত, একথা ভেবেছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আগে থেকেই করেছিল মজিদ। কেরোসিনের চুলো আর চারটে হাঁড়িকুড়ি ইতোমধ্যেই কিনেছিল। তাছাড়া কিনেছিল রান্নার জন্য দরকারি কিছু জিনিস। জিনিস গুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল মেঝেতে। একজোড়া মমতাভরা মেয়েলি হাতের জন্য তারা যেন অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সে মেয়েলি হাত তখন পর্যন্ত এসে পৌঁছেনি।

বিছানার ওপর বসে সমুখে দুপা মেলে দিয়ে বসেছিল মজিদ। ভাবছিল। তবে ভাবনার কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ছিল না। তার চোখের সামনে ছিল খোলা জানালা। ঘরের দুদিকে দুটো খোলা জানালা। ছেঁড়া পর্দার ফাঁক দিয়ে জানালার বাইরে দেখা যাচ্ছিল অন্ধকার। দেখা যাচ্ছিল জোনাকি। দেখা যাচ্ছিল আবারো অন্ধকার। এবং আবারো জোনাকি।

ঘরের উজ্জ্বল হারিকেন বাইরের অন্ধকারকে যেন প্রভাবিত করতে পারছিল না মোটেই। বরং কীভাবে যেন বাইরের অন্ধকারই আক্রমণ করেছিল ঘরের আলোটাকে! আশ্চর্য, পৃথিবীতে তাহলে এমন ঘটনা ঘটে যখন অন্ধকার আক্রমণ করে আলো, এই কথা ভেবেছিল তখন মজিদ। আর ভেবেছিল তার মোবাইলের কথা। রাশিদাকে মোবাইল করবে কী করবে না, এই কথা।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে মজিদ গুছিয়ে তুলেছিল ঢাকা থেকে কিনে আনা খাবারগুলো। বাড়ি তৈরির সময় বুদ্ধি করে ঘরের দেয়ালে কয়েকটা সিমেন্টর তাক কেটেছিল সে। মিস্ত্রি দিয়ে কাটিয়েছিল। সেখানে জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে নিজেকেই প্রশংসা করল সে। তাক না থাকলে এসব জিনিস সে কোথায় গুছিয়ে রাখত? এই সময় বেজে উঠেছিল তার মোবাইল। পকেট থেকে মেবাইল বের করে হ্যালো বলতে রাশিদা এপ্রান্ত থেকে বলে

উঠেছিল, তুমি কোথায়? মোবাইল অন করলেই এই প্রশ্নটা রাশিদা তাকে সবসময় করত। যেদিন থেকে রাশিদার হাতে মোবাইল উঠেছিল, সেদিন থেকেই মজিদকে সে প্রথমে এই একটা প্রশ্নই করত, তুমি কোথায়?

রাশিদার প্রশ্ন শুনে মজিদ বলেছিল, আমি আশুলিয়া। আমাদের বাড়িতে।

'আমাদের বাড়িতে।' কথাটা বলতে পেরে মনে মনে খুব গর্ব বোধ করেছিল মজিদ। রাশিদা যেন কথাটা ভালো করে কানে শোনেনি এমনি ভাব করে বলেছিল, তুমি ভালো আছো তো? ঠিক আছো তো? পুরুষের জন্য প্রিয় রমণীর অহেতুক উদ্বিগ্নতা সর্বদাই পুরুষকে বড় প্রীত করে। সকালের বাগ্‌বিতণ্ডা ভুলে গিয়ে মজিদ বলেছিল, হ্যাঁ। রাশিদা তখন বলেছিল, তোমার ছেলেরা তুমি আজ জমিতে রাত কাটাবে শুনে তোমার কাছে আজ থাকতে বায়না ধরেছিল। কথাটা শুনে খুব খুশি হয়েছিল মজিদ। খুশির চোটে সে বলে উঠেছিল, জানো, আজ এখানে একজন আমাকে কী বলল? 'কী?' জিজ্ঞেস করেছিল রাশিদা। 'বলেছিল আমাদের এই জমিটাতে নাকি'—কথাটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল মজিদ। জানত এরকম কথা শুনে মোটেও খুশি হবে না রাশিদা।

মোবাইল শেষে রাশিদা বলেছিল, সাবধানে থেকো। অত বড় জমিতে একা একা রাত কাটানো আমার মোটে পছন্দ নয়।

'আমি সাবধানেই থাকব।' বলেছিল মজিদ।

'রাতে ঘুমোবার আগে ঘরের দরজা ভালো করে বন্ধ করে রেখো।' বলেছিল রাশিদা। আর তার উত্তরে এ-প্রান্তে মাথা হেলিয়ে মজিদ বলে উঠেছিল, আচ্ছা।

এরপর রাতের খাওয়া সারা ছাড়া আর কিছু যেন করার ছিল না মজিদের। দুধ দিয়ে চিঁড়া ভিজিয়ে খেয়ে এক কাপ লাল চা পান করে মজিদ এপর বিছানায় এসে পা তুলে বসেছিল। ঢাকা ছেড়ে আসার সময় ভুল করে হাতে কোনো নিউজপেপার বা ম্যাগাজিন সঙ্গে আনেনি। সুতরাং হ্যারিকেন নিভু নিভু করে আপন মনে এলোমেলো ভাবনা করা ছাড়া আর কিছু তার সে-মুহূর্তে করার ছিল না। এভাবেই চিন্তা করতে করতে একটু পরে ঘুমিয়ে গিয়েছিল সে। গভীর ঘুমে তরিয়ে গিয়েছিল মজিদ। ঘুমের ভেতর স্বপ্নে দেখেছিল তাকে ছারপোকা জাতীয় কিছু কামড়াচ্ছে। সে ঘুম থেকে জেগে গিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে দেখেছিল সত্যি তার বিছানায় ছোট ছোট এক ধরনের পোকা ঘুরঘুর করছে। তাদের হাত দিয়ে সরিয়ে বিছানা ঝেড়ে আবার নতুন করে পেতে সে ঘুমিয়েছিল। তখন আবার তার স্বপ্নের ভেতরে কে যেন হ্যাচং, হ্যাচং করে টিউবওয়েল টিপতে শুরু করেছিল। আর সে ঘুমের মধ্যেই 'আরে এতরাতে টিউবওয়েল টেপে কে' বলে ঘুম থেকে জেগে গিয়ে লাফ মেরে ঘরের জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তখনো ঘরের জানায় পর্দা ঠিকমতো লাগানো হয়নি। ছেঁঅ ও তালি দেওয়া দুটো পুরনো পর্দা ঢাকার বাসা থেকে এনে কোনোরকমে জানালা দুটোর আব্রু রক্ষা করা হয়েথে। সেই পর্দা সরিয়ে মজিদ তখন তাকিয়ে দেখেছিল বাইরে। কিন্তু টিউবওয়েল চালাবার শব্দ আর শোনেনি। বদলে দেখেছিল একটা অসম্ভবভাবে ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ। আর তার আলোয় কারা যেন পিলপিল করে তার জমির চৌহদ্দির ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে! তারা নড়ছে, ক্রমাগত নড়ছে এবং নড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা করছে।

কিছু একটা করছে! কারা যেন কিছু একটা করছে। বোগাস। কথাটা ভাবতে ভাবতে আবার সে ফিরে এসেছিল বিছানায়।

আর ঠিক সেই সময় তার কানে এসে বেজেছিল বিজাতীয় দুটি শব্দ। একটা ফুস্ আরেকটা ফস্। আগে ফুস্, তার একটু পরে ফস্। ফুস-ফুস্।

এতদিন ধরে এই জমিটার ওপর মজিদ কাজ করেছে। রাজমিস্ত্রি ও কামলা খাটিয়েছে। কত রাত অব্দি নিজে তাদের সঙ্গে থেকেছে, যদিও রাত কাটায়নি। সপ্তাহের ছুটির দিনগুলোয় ঢাকার সংসার ফেলে রেখে সারাদিন জমিতে কাটিয়েছে, কিন্তু কোনোদিন এ ধরনের কোনো শব্দ সে কানে শোনেনি, কথাটা ভেবে তখন বিস্মিত হয়েছিল মজিদ।

কেন শোনেনি?

তখন হঠাৎ সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে দেখা হওয়া সুলেমান মণ্ডলের কথা মনে পড়েছিল।

'সাবধানে থাকবেন' এই কথা বলেছিল মধ্যবয়সী সেই লোকটা নাম সুলেমান মণ্ডল।

কথাটার আসল মানেটা কী ছিল? কেন সে কথাটা বলেছিল?

আরো বলেছিল, 'জমিটা ঝামেলার, কয়েকবার হাতবদল হয়েছে। একবার রক্তারক্তিও হয়েছিল।'

উরেব্বাস, রক্তারক্তি!

কথাটা যেন এতখানি সময়ে ফারাকে এই প্রথম সম্যক উপলব্ধি করল মজিদ।

আরে, ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়াল? এ জমি কি তাহলে তারও হাতছাড়া হয়ে যাবে? আবার একবার হাতছাড়া? কথাটা ভেবে তার শরীর অবশ হয়ে এলো। জমি হাতছাড়া হয়ে যাবে! জমি হাতছাড়া হয়ে যাবে! হঠাৎ করে যেন বিলাপ শুরু হয়ে গেল মজিদ শিকদারের ভেতর।

তরে রক্ত জল করা পয়সায় কেনা জমি, তার ব্যাংক লোনের টাকায় কেনা জমি, যে লোন শোধ করতে তার বিশ বছর লেগে যাবে, সেই লোনের টাকায় কেনা পাঁচ কাঠার এই জমি; আশুয়ালিয়া বাজার ছাড়িয়ে, সদর রাস্তা ছাড়িয়ে, চতুষ্কোণ ক্ষেত, আলপথ এবং বন্ধ্যা জমি মাড়িয়ে ছোট্ট যে জমিটার ওপর এতদিন ধরে এত মাস ধরে মজিত তার নিজের, পূর্বপুরুষের ইতিহাসের ও চেতনার স্বপ্ন বুনে দিয়েছে, সেই জমি থেকে তাকে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে কি কেউ? সেই জমি তার হাতছাড়া হয়ে যাবে?

কথাটা ভাবতে গিয়ে যেন মাথার গরম হয়ে গেল তার। তালগাছ, জমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা তার তালগাছ, রোজ সন্ধ্যেয় যেখানে বাবুই পাখিরা তাদের হাইয়ের শুকনো খোলের মতো ঝোলানো খড়ের ঘরে ঢোকার আগে তুলকালাম বাধায়, তাদের কিচিরমিচিরে যেখানে সন্ধ্যার বাতাস বড় অস্থির হয়ে রোজ দুলতে থাকে, সেখানে মজিদ তার অতীতের উৎসের সন্ধান করতে, সেই জমি থেকে তাকে উৎখাতের চেষ্টা করাটা কি চাট্টিখানি কথা হলো।

হ্যাঁ?

ভয় আর এখন মজিদকে ধরে রাখতে পারছে না। রাতও এমন কিছু আর বেশি নেই। হয়তো আর কিছুক্ষণ বাদে আজান পড়বে। ঘরের হুড়কো খুলে ফেলল মজিদ। বাইরে পাতলা অন্ধকারে বৈঠায় এসে দাঁড়াল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। একটা নিথর স্তব্ধতা। এরকম স্তব্ধতার কারণ কী? সে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাল। সেখানে মাছের আঁশের মতো মরা একটা চাঁদ। তারপর নিচে চোখ ফেলে তাকিয়ে দেখল চারদিকে। তাকাতে গিয়ে স্বতব্ধ হয়ে গেল। বাঁশের চটা দিয়ে মজিদ ঘিরেছিল তার জমি। কিন্তু বাঁশের চটা আর নেই। বস্তুত বাঁশের কোনো বংশও নেই! বদলে সেখানে দেখা যাচ্ছে অন্য কিছু।

আরো কাছে এগিয়ে গেল মজিদ। কী ওটা, ওটা কী? বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে গেল সে। ইট! ইট? আমার জমিতে ইট? ইটের দেয়াল? কথা বলতে বলতে দৌড়ে গেল মজিদ। কাছে গিয়ে হাত দিয়ে টিপে দেখল। আরে, সত্যিই দেয়াল তো! স্বপ্নের ভেতরে নয়, বাস্তবতার ভেতরে এই দেয়াল। এটা তার বাড়ি পূর্বদিক। পূর্বদিকে রাতারাতি দেয়াল তুলে ফেলেছে কেউ।

কী সর্বনাশ! মজিদের মাথার ভেতরে রক্ত যেন চিড়িক দিয়ে ওঠে। চোখ বড় বড় হয়ে যায়, লুঙ্গি মালকোচা মেরে শূন্যে লাফ দিয়ে ওঠে সি। চিৎকার করে বলে, এ হে হে হে, কোন্ হারামজাদা আমার জমির ওপর—

কথা তার শেষ হয় না। মাঝপথে থেমে যায়, যেন বাকরোধ হয়ে যায়, যেন সে হতবস্তু, যেন যে স্থবির, যেন তার মাথায় হঠাৎ বজ্রাঘাত। দেয়াল কি মজিদের জমির পুবদিকে? দেয়াল দগিক্ষণ দিকেও বটে! আর দেয়াল তার জমির উত্তর দিকেও! দেয়াল এখন মজিদ শিকদারের চুতুর্দিকে।

দেয়াল তার জমিকে ঘিরে।

মজিদের চারপাশে এখন দেয়ালের রাজ্য। অনেক উঁচু দেয়াল। আনেক, অনেক উঁচু। জেলখানার দেয়ালের চেয়েও এই দেয়াল উঁচু। দেয়াল দেখতে গিয়ে মাথা ঘুরে উঠল তার। মজিদ এখন কী করে?

হায়, মজিদ এখন কী করে?

কিন্তু না, হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। মজিদ হাল ছেড়ে দেবে না। হাল ছেড়ে দেওয়ার মানে পতন। আর পতন মানে মৃত্যু। তা হতে পারে না। নিজ জীবিত থাকতে তা হতে দেবে না। দৌড়ে যায় এবার মালকোচা পরা মজিদ শিকদার।

দক্ষিণ দিকের দেয়ালে সে তার হাত দুটো ছড়িয়ে দেয়। অনুভব করে। এখনো কাঁচা! গাঁথুনি এখনো কাঁচা। কাঁচা দেয়ালে শরীর থেকে বেরোচ্ছে সদ্য প্রলেপ লাগানো বালু ও সিমেন্ট। হাতে উঠে আসছে মিহি বালুকণা। ভিজে যাচ্ছে হাত।

সুতরাং গায়ের জোরে দেয়াল এখনো ফেলে দেওয়া সম্ভব!

মজিদ একটু দূরে সরে গিয়ে দৌড়ে এসে ধাক্কা দেয় দেয়ালে। শরীরে পুরো ভার নিক্ষেপ করে ধাক্কা দেয়। হেঁইও, হেঁইও, হেঁইও, জোরসে মারো হেঁইও। কিন্তু কোথাও ফাটল ধরাতে পারে না।

স্থাবর বস্তুর কত যে শক্তি, মজিদ কি এর আগে তা জানত না?

মজিদ এখন চার দেয়ালের ভেতরে বন্দি। মজিদ কীভাবে তার জমি ছেড়ে বেরোবে? তার যাতায়াতের রাস্তাই বা কোথায়? বেরোবার রাস্তা আগে ঠিক না করে মজিদ ভেতরে ঢুকেছিল, এত বড় আহম্মক কি পৃথিবীতে আর আছে। মজিদ দৌড়োতে থাকে জমির এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। পুব -পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ দৌড়োতে থাকে। একবার এ-দেয়ালে ধাক্কা মারে। আরেকবার অন্য দেয়ালে।

'এই যে মিয়া ভাই, শুনিছেন? আমারে একটা সাহায্য করবেন? মজিদ মাঝে মাঝেই তার বাল্যকালের ভাষায় কথা বলতে থাকে। কথা বলতে বলতে হাঁক দেয়। কিন্তু কে তার ডাকে সাড়া দেয় না। ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙে যায় তার, ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে যায়, ক্লান্ত হয়ে যায়, মজিদ মাটিতে বসে পড়ে। এখন সারা শরীর তার কর্দমাক্ত, চোখ লাল, চুল এলেবেলে, নাক দিয়ে অনর্গল পানি বেরোচ্ছে, আর তখুনি যেন তার চোখের সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়াল সেই তালগাছ। এই সেই তালগাছ। যাকে চোখে দেখে পূর্বাপর চিন্তা না করে মজিদ কিনে ফেলেছিল পাঁচ কাঠা এক জমি। সে-জমিতে প্রবেশের পথ নেই জেনেও প্রতিবেশীদের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে কিনে ফেলেছিল সে। কিন্তু প্রতিবেশীরা সদিচ্ছা দেখায়নি। বরং মজিদকেই তাদের রাজ্যের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দেখেছে। মজিদ আগে থেকে না জেনে না বুঝে চতুর দালালের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে।

এখন উপায়?

ফুস, ফস্, ফুস, ফস্, ফস্!

শব্দটা উঠছে তালগাছ থেকে। মজিদ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে তালগাছের দিকে। সেখানে কী যেন একটা নড়ছে! কিন্তু তার ভাবনার ভেতরেই চোখের সামনে ঘটতে থাকে তেলেসমাতি সব কাণ্ড। উঠোনের টিউবওয়েল যেন নড়েচড়ে ওঠে, শব্দ হয় হ্যাচং, হ্যাচং, হ্যাচং। গলগল করে বেরোতে থাকে পানি। পানিতে উঠোন যেন সয়লাব হয়ে যায়। হঠাৎ যেন ঘোর ভেঙে যায় মজিদের। সে মাটি থেকে হাভ মেরে ওঠে দৌড়ে গিয়ে টিউবওয়েলের ডান্ডা চেপে ধরে। কিন্তু ডান্ডার ধাক্কায় সে চিৎ হয়ে পড়ে যায় উঠোনে। এরপর বন্ধ্য জমিটার দিকে থেকেও আওয়াজ ওঠে শোঁ, শোঁ। কীসের শোঁ, শোঁ? নাকি বন্ধ্যা মাটি ফেটে সেখানেও বেরিয়ে আসছে পানি। উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে অবরুদ্ধ জলধারা। আর সেই সঙ্গে ফুসফস্, ফুসফস্, ফুসফস্। মজিদ এবার দৌড়ে তার বাড়ির পৈঠায় উঠে দা-পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে তাকায়। তালগাছে উত্তঙ্গ মাথায় বসে আছে একটা কিছু। সেই 'কিছু'টা নড়তেই বতাসে শব্দ ওঠে ফুসফস্। তালগাছের শুকিয়ে ওঠা পাতার শব্দ।

কোনো কিছু ঠিকমতো দেখা যায় না।

মজিদ ঘর থেকে লম্বা হুটলটা বের করে কাঁপতে কাঁপতে টুলের ওপর উঠে দাড়ায়। এবার সে দেখে। ভালো করে দেখে। বসে আছে একটা শকুন। তালগাছের মাথায় শকুন। তার শরীরে কদর্য কালিমায়, বক্র ঠোঁটে, কুটিল চোখে, তীক্ষ্ণ নখরে জগতের যাবতীয় সজীব বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা।

তার শরীরে ঘর্ষণে নড়ে উঠছে বাতাস মড়মড়, খড়খড় শব্দ উঠছে বাতাসে, ফুসফস্, ফুসফস্ শব্দ উঠছে। তার চঞ্চুর ক্ষিপ্র জায়গা বদল করার ভঙ্গিতে নিটোল যা কিছু তা ছিঁড়ে পর্দাফাই করার আনন্দ। কোনো অশুভ কিছুর আগমনী বার্তায় শকুন যেন এখন চঞ্চল ও অভিগামী। প্রাচীরবেষ্ঠিত মজিদ এখন আবারো স্থির। ওদিকে শকুন নড়ছে, তালপাতা নড়ছে, পাখিহীন বাবুই পাখির বাসা নড়ছে, বন্ধ্যা জমিতে শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ, টিউবলের নড়ছে হ্যাচং, হ্যাচং; ঘরে রেখে আসা মোবাইল একভাবে বাজছে, ভোর গড়িয়ে গেছে, সকাল গড়িয়ে গেছে, দূরের মক্তবের সরু বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখা ঘন্টায় বাজছে ঢং ঢং ঢং ঢং।

বেলা বারোটা। বারোটা ঘন্টা না বাজলে তো বারোটা হয় না। না-কি হয়?